আওয়ামী লীগ কী নির্বাচন বর্জন করবে

wj‡L‡Qb RqšÍ AvPvh

সোনালী ব্যাংকে চাকরি করেন সিদ্দিকুর রহমান। মতিঝিল থেকে বাংলা মোটর অফিসে আসার জন্য বাসে তার পাশে সিট নিয়ে বসেছিলাম। সাংবাদিক পরিচয় জেনে তিনি রাজনীতির বিষয়ে বেশ আলাপ জমালেন। বললেন, দেশের রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতার কথা। লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তীব্র বিদ্যুৎ, পানি সংকট, সন্ত্রাস সব কিছু মিলে তিনি ক্ষুব্ধ। এক পর্যায়ে সিদ্দিকুর রহমান জিজ্ঞাসা করলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কি সত্যিই অনুষ্ঠিত হবে। বিরোধী দল কি নির্বাচনে যাবে? যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে না যায় তাহলে দেশ কোন দিকে যাবে। সিদ্দিকুর রহমানের মতো এমন অজানা ভয় দেশের সাধারণ মানুষকে তাড়িত করছে। দেশের রাজনীতিতে কার্যত এখন ঘোলাটে এক পরিবেশ বিরাজ করছে। রাজনীতিতে ঘটছে নাটকীয় ঘটনা। সরকার পতনের এক দফার আন্দোলন থেকে আওয়ামী লীগ সরে এসেছে। কিছুটা ব্যাক গিয়ারে গিয়ে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের দাবি তুলেছে। একই সঙ্গে বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ছাড়া আওয়ামী লীগ আগামী জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশ নেবে না। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে সমমনা দলগুলো। প্রশ্ন উঠেছে একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের নির্বাচন বর্জনের হুমকি কতটা যৌক্তিক। এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবির যৌক্তিকতা ন্যূনতম উপলব্ধি না করেই খালেদা জিয়া প্রত্যাখ্যান করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার ইস্যুতে সরকার ও বিরোধী দল দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। সূত্র বলছে, রাজনীতির এ ঘোলাটে পরিস্থিতির পর্দার অন্তরালে চলছে নানা হিসাব। প্রধান দুই দল নির্বাচনে ভোটের হিসাব করছে। চলছে জোটের হিসাব। প্রভাবশালী কূটনীতিকদের দলের পক্ষে রাখার চেষ্টা। কূটনীতিকদের তোষামোদের নগ্নতা দেশের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্বকে আরো প্রকট করে তুলেছে।

রাজনৈতিক প্রধান দলগুলোর এখন বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, জনগণ নয়, প্রভাবশালী বহিঃশক্তি তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসবে বা টিকিয়ে রাখবে। এ কারণে তারা জনগণের ওপর আস্থা না রেখে প্রভাবশালী দেশের কূটনীতিকদের ওপর আস্থা রাখতে সদা প্রস্তুত। আওয়ামী লীগ, বিএনপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলে দেখা যায়, কূটনীতিকদের পক্ষ বা বিপক্ষে থাকার হিসাব। দল, জনগণের হিসাব নেই।

দেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের জনগণের মধ্যে রয়েছে শক্ত ভিত। দেশের গণতান্ত্রিক ধারা বিকাশে দলটি রেখেছে অগ্রণী ভূমিকা। '৯৬ সালে দলটি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে যেন অন্তশক্তি হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতার মোহে নেতারা কর্মী-সমর্থকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। নেমে পড়ে ভাগ-বাটোয়ারায়। অথচ এ সময় আওয়ামী লীগের দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে শক্তিশালী করতে কিছু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করতে পদক্ষেপ নিতে পারতো। নির্বাচন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে আলাদা করতে পারতো। আইন করে নির্বাচনে কালো টাকার দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পারতো। উদ্যোগ নিতে পারতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ত্রুটিগুলো সংশোধনীর। আওয়ামী লীগ তা করেনি। বরং দলীয়করণ করে নির্বাচন কমিশনকে কুক্ষিগত রাখতে চেয়েছে। এ কারণে আজ আওয়ামী লীগ যে দাবি তুলেছে তা দেশের জনগণ বিনা বিতর্কে মেনে নিতে পারছে না। তাদের মনে পাল্টা প্রশ্ন এসেছে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থেকে এ কাজগুলো কেন করেনি। আবারো ক্ষমতায় গিয়ে তারা কি এ কাজগুলো করবে! ক্ষমতা হারানোর পরই কেন শুধু বোধোদয় হলো নির্বাচন কমিশন সংস্কারের। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের জন্য সংশোধনী আনতে হবে?

আসলে আওয়ামী লীগ চলছে এক উদ্ভট উটের পিঠে। দিগ্‌ভ্রান্তভাবে। ২০০১ সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পর আওয়ামী লীগ তার পরাজয়ের বাস্তব কারণ খোঁজেনি। ভোটের সমীকরণের হিসাব কষেনি। সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। নিজেদের ব্যর্থতার কারণ তারা দেখেনি। বিরোধী দলীয় নেত্রী নির্বাচনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে সূক্ষ্ম কারচুপির কথা বলে সংসদ বর্জনের হুমকি দিয়েছে। নেতা-কর্মীরা পালিয়ে এসেছে এলাকা থেকে। পালিয়েছে দেশ থেকে। তখন আওয়ামী লীগকে অন্তসারশূন্যই মনে হয়েছে। নির্বাচনের পরই আওয়ামী লীগের উচিত ছিল ঘর গোছানো। দিগ্‌ভ্রান্ত সমর্থকদের জড়ো করা।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২০০২ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিলে তুলনামূলক তরুণ নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসা হয়। সবাই ভেবেছিল নব নির্বাচিত নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দৃঢ় ভিতের ওপর দাঁড় করাবে। তা হয়নি। বরং বেড়েছে অন্তর্কোন্দল। প্রাজ্ঞ তিন নেতা আব্দুর রাজ্জাক, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদ সাধারণ সম্পাদকের পদে বঞ্চিত হয়ে অভিমানে দূরে সরে দাঁড়িয়ে ছিলো। নেত্রীও তাদের সংগঠনে সক্রিয় করে তুলতে উদ্যোগ নেননি। দলীয় নেত্রীর দায়িত্ব সকলকে নিয়ে দল পরিচালনার। নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এ কাজটি করেন না। গত তিন বছর দল চালিয়েছেন এমন তিনজনকে কাছে নিয়ে,

আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় বাধা অন্তর্কোন্দল। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নানা সমীকরণে অন্তর্কোন্দল বিরাজ করছে। এ কোন্দলের কারণে জেলা-উপজেলা সম্মেলন দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাউন্সিলের দুই বছর পরেও এক তৃতীয়াংশ জেলা সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি

নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রশ্নে আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কার বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে করতে হবে। '৯৬ সালের কথা নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী ভুলে যাননি। আগামী নির্বাচনে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অচিরেই আন্দোলনরত দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের একটি সমন্বিত নীতিমালা উপস্থিত করা হবে।

শেখ হাসিনা
বিরোধী দলের নেত্রী

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হয়। এটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী কোনো কাজ নয়। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ্ধতি প্রচলন হয়েছিল অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য। ২০০১ সালের নির্বাচন প্রমাণ করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন বা রাষ্ট্রপতির ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তারা যথাযথভাবে পালন করতে পারেনি। বর্তমান বাস্তবতায় অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয়।
ডা. এস এ মালেক, উপদেষ্টা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি আমরাই তুলে ছিলাম। দুইটি নির্বাচনের পর এই ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সংস্কারের দাবি তোলা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনমুখী দল। নির্বাচন বর্জনের এখনও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।
আমির হোসেন আমু, প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সংস্কার করতে হবে। এ বিষয়ে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। দাবি উপেক্ষা করে নির্বাচনে গেলে, আওয়ামী লীগ নির্বাচন বয়কট করবে। পরিণতি হবে ভয়াবহ। অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্য বিএনপি দায়ী থাকবে।
তোফায়েল আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ

নির্বাচনই আওয়ামী লীগ মুখ্য বিষয় মনে করে। নির্বাচন হচ্ছে রাজনীতির অন গোয়িং প্রসেস। এ ধরনের প্রসেসে পরিবর্তন আসে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কার করেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে।
কাজী জাফর উল্ল্যাহ এমপি, প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের দাবি অস্বীকার করেই খালেদা জিয়া পার পাবে না। আগামী দিনে আন্দোলনের মাধ্যমে এ দাবি মানতে বাধ্য করা হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কার করেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যাবে।
ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী লীগ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ২/৩টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই তিনটি নির্বাচনেই প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষ থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু হয়নি বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা কার্যক্রম ও পদ্ধতিগত দিকেও প্রশ্ন উঠেছে। বিগত ১০ বছর এই সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে বিতর্ক চলছে। বিতর্ক হওয়ার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। সকল বিতর্কের অবসান ঘটানোর জন্যই এই সরকারের পরিবর্তন প্রয়োজন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাইবেল নয় যে একে পরিবর্তন করা যাবে না।
অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনী ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের দাবি তো আজ শুধু আওয়ামী লীগের নয়। সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল, গণমানুষের। আগামীতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এ দাবি মেনে নেয়া উচিত।
ড. হামিদা বানু শোভা, সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ

বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে দলীয় লোককে নির্বাচিত করার জন্য বিচারকদের বয়সসীমা বৃদ্ধি করেছে। নির্বাচন কমিশনে দলীয় লোক প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা করছে। প্রশাসনকে নির্লজ্জভাবে দলীয়করণে করেছে। সুতরাং একটি নীল নকশার নির্বাচনী নাটক এ দেশের জনগণ কখনই মঞ্চস্থ হতে দেবে না।
রায় রমেশ চন্দ্র, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক লীগ

যাদের শুধু রয়েছে ব্যবসায়ী পরিচিতি। কোটি টাকার সূত্রে তারা আওয়ামী লীগে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতাদের অভিযোগ, এই ব্যবসায়ী নেতারাই দলকে আগাতে দেয় না। এমন কি এমন নেতাদের সঙ্গে বিশেষ ভবনের ব্যবসায়ী স্বার্থ রয়েছে বলেও দলে গুঞ্জন রয়েছে। সূত্র জানায়, এমন কিছু অভিযোগ পাবার পর, নেত্রী এদের সম্পর্কে একটু সাবধান হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় বাধা অন্তর্কোন্দল। তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত নানা সমীকরণে অন্তর্কোন্দল বিরাজ করছে। এ কোন্দলের কারণে জেলা-উপজেলা সম্মেলন দ্রুত করা সম্ভব হচ্ছে না। কাউন্সিলের দুই বছর পরেও এক তৃতীয়াংশ জেলা সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দূরদৃষ্টির অভাবে সম্মেলনের পরও জেলার কোন্দল মিটছে না। কোন্দল শুধু জেলাতেই নয়, অঙ্গ সংগঠনগুলোয়ও তীব্র। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের দুই নেতা মোঃ হানিফ ও মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মধ্যে দীর্ঘদিনের রেষারেষি আরো তীব্র হয়েছে। আওয়ামী লীগের সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ৩০ এপ্রিলের সরকার পতনের দলীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের ডেডলাইনে। ৩০ এপ্রিল ডেডলাইন উত্তরণের পর পার্টিটি আরো ঝিমিয়ে পড়ে। আবদুল জলিল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে চাঙ্গা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আওয়ামী লীগ ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, কিবরিয়া হত্যার মতো নানা ইস্যু পেয়েও রাজপথে আন্দোলন জমাতে পারেনি। কিবরিয়া হত্যার পর দলটি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। তবে বাম সমমনা দল নিয়ে জোট গঠন আওয়ামী লীগের একটি বড় সফলতা। সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ নির্বাচন বর্জনের হুমকি দিলেও, ভেতরে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রয়েছে প্রার্থী মনিটরিং সেল। জানা গেছে, আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যে প্রায় ১৫০ আসনে প্রার্থী চূড়ান্ত করে ফেলেছে। সরাসরি না বললেও নেত্রী নির্বাচনে প্রস্তুতির জন্য অনেককেই সবুজ সঙ্কেত দিচ্ছেন।

কার্যত আওয়ামী লীগ এখন চায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনী ইস্যুতে সব বিরোধী দলকে এক কাতারে নিয়ে আসতে। কারণ বিরোধী সকল দলই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন সংস্কারের পক্ষে। আওয়ামী লীগ এই ইস্যুতেই মহাজোট গড়ে তুলতে চায়। যেহেতু সকল বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার চায়। এ কারণে এই ইস্যু নিয়ে আওয়ামী লীগ ডায়লগ শুরু করেছে। এরশাদের জাতীয় পার্টি ও বদরুদ্দোজার বিকল্প ধারাকে আওয়ামী লীগ এ ইস্যুতে কাছে পাবে বলে ধারণা করছে। তারা কূটনীতিকদের

কাছে ইতিমধ্যে এ ইস্যুতে সাড়া পেয়েছে। জানা গেছে, এ সপ্তাহে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংশোধনীর চূড়ান্ত রূপরেখা দেবে। সকল রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে সংশোধনীর রূপরেখা চাইবে। সকল দল মিলে অভিন্ন একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবে। আগামী মাসেই বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি দেবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে রাজনৈতিক দলের খসড়া প্রস্তাবনার মিল রয়েছে। খসড়া প্রস্তাবনায় রয়েছে, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে। এ নিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এজন্য সংবিধান সংশোধনীর প্রয়োজন নেই। প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রপতির হাতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে থাকতে হবে। সর্বজনগ্রহণযোগ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে স্বশাসিত ও স্বাধীন করতে হবে। আওয়ামী লীগ মনে করছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চূড়ান্ত সংশোধনী রূপরেখা সব দলের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুতই করা সম্ভব হবে।

পারে তা খালেদা জিয়াও বুঝতে পারছেন। কার্যত জোট এখন বিএনপি, জামায়াতের মধ্যে টিকে রয়েছে। জোটের দুই শরিকের টানাপড়েন বিএনপি আরো জামায়াত- নির্ভর হয়ে উঠেছে।

গত সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে জামায়াত সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরানো ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জামায়াতকে অসন্তুষ্ট করেননি খালেদা জিয়া। দলের অভ্যন্তরীণ চাপেই প্রধানমন্ত্রী এ কাজটি করেছিলেন। তাছাড়া সরকারের সমস্ত কাজই জামায়াতের পছন্দমতো হয়েছে। তাদের ইচ্ছের বাইরে কোনো পদক্ষেপ বিএনপি নেয়নি। প্রশাসনিক বিষয়ে জামায়াতের পরামর্শমাফিক সরকার চলেছে। জামায়াত স্বরাষ্ট্র সচিবসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়েছে তাদের লোক। জামায়াতপন্থিরাই পেয়েছে নিয়োগ, পদোন্নতিতে অগ্রাধিকার। জামায়াতের একটি সূত্র জানিয়েছে, আগামী নির্বাচনে জামায়াত বিএনপির কাছে ৬০ আসন দাবি করবে। আগামী সংসদে তাদের আসন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নিয়েই তারা অগ্রসর হচ্ছে।

গত সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে জামায়াত সবচেয়ে লাভবান হয়েছে। মতিউর রহমান নিজামীকে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সরানো ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জামায়াতকে অসন্তুষ্ট করেননি খালেদা জিয়া। দলের অভ্যন্তরীণ চাপেই প্রধানমন্ত্রী এ কাজটি করেছিলেন। তাছাড়া সরকারের সমস্ত কাজই জামায়াতের পছন্দমতো হয়েছে

আওয়ামী লীগ আসলে '৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনের মডেলকে ফলো করেই এগোতে চাচ্ছে।

দেশের জনগণ স্বচ্ছ নির্বাচন চায়। এর জন্য প্রয়োজন সংস্কার। এ দাবি অস্বীকার করে বিরোধী দলবিহীন নির্বাচনে গেলে, বিএনপি আরো একটি ১৫ ফেব্রুয়ারির জন্ম দেবে। দেশে-বিদেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না। বিএনপি ভোটারবিহীন নির্বাচন করেও পার পাবে না।

কার্যত বিএনপি আওয়ামী লীগের নির্বাচন বর্জনের হুঙ্কারে একটু শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া জোটে এখন চলছে ভাঙাগড়া। ইসলামী ঐক্যজোটের এক অংশ ফজলুল হক আমিনী ইতিমধ্যে বিদ্রোহ করেছে। জাতীয় পার্টির একাংশের নেতা নাজিউর রহমান মঞ্জুর জোট নিয়ে নানা বিতর্কিত বক্তব্য দিয়ে চলছে। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে মঞ্জুর কি এরশাদের জাতীয় পার্টি না আওয়ামী লীগে ভিড়ে যাচ্ছে! নাজিউর রহমান মঞ্জুরের আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিত ছিল। বিগত আওয়ামী লীগের সময় ভোলার রাজনীতিতে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েন। তখন বাধ্য হয়েই বিএনপির দিকে ঝুঁকে পড়েন। নাজিউর ডিগবাজি দিতে বিএনপির ওপর ভর করে জামায়াত হয়ে উঠেছে অপ্রতিরোধ্য। জামায়াত দাবি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ফর্মুলা তারাই প্রথম তুলেছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সংশোধনী নিয়ে জামায়াত নীরব। তারা বিএনপিকেই সংশোধনীর বিরুদ্ধে কথা বলতে ব্যবহার করছে। নিজেই চুপ রয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাখ্যান নিয়ে বিএনপির মধ্যে চলছে বিরোধ। বিএনপির একটি মহল মনে করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন সংস্কার নিয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনায় যাওয়া উচিত। আওয়ামী লীগের বৃহত্তর জোট গড়া ও আন্দোলন করার কোনো সুযোগই দেয়া ঠিক নয়। তাদের যুক্তি, একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেও জোট এখনো জিতে আসতে পারে। কারণ আওয়ামী লীগের নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে উঠতে পারেনি। দিগ্‌ভ্রান্ত আওয়ামী লীগ নির্বাচনে গিয়ে বেকায়দায় পড়বে।

জানা গেছে, বিএনপি ইতিমধ্যে প্রায় ২২৫ আসনে তাদের প্রার্থী চূড়ান্ত করে ফেলেছে। তাদের দিয়েছে সবুজ সংকেত। সরকারিভাবে তাদের নির্বাচনী অর্থ আয় করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকায় সরকারি অর্থে চলছে নির্বাচনী উন্নয়ন। শুধু কালো টাকা আর তথাকথিত উন্নয়ন দিয়েই ভোটে জেতা যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। বিগত নির্বাচনে এলাকায় উন্নয়ন ও কালো টাকা খরচ করেও আওয়ামী লীগের অনেক মন্ত্রী ধয়াশায়ী হয়েছে। কারণ ছিল দলীয় নানা ব্যর্থতা। জোট সরকারের গত সাড়ে তিন বছর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিরাজ করছে স্থবিরতা। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের লুটপাট তো অতীতকেও হার মানিয়েছে। আওয়ামী নেতা-কর্মীদের তারা ঘরছাড়া করেছে। কার্যত বিএনপি সমর্থকেরা পার্টির নানা ব্যর্থতায় হতাশ। এ কারণে বিএনপিকে জিততে হলে জামায়াতের নির্ধারিত ভোটব্যাংকের ওপর আরো নির্ভর করতে হবে।

বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল বলে দাবি করে। অথচ গত এক যুগেও পার্টির সম্মেলন হয়নি। কেন্দ্রীয় সম্মেলন না হওয়ায় জেলা সম্মেলন হয়নি। জেলা পর্যায়ে সম্মেলন না করে তারেক রহমান হাতিতে চড়ে, দোয়েল পাখি উড়িয়ে ইউনিয়ন সম্মেলন করেছেন।

আগামী নির্বাচনে এরশাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন। বিগত দুটি নির্বাচনে এরশাদ দাঁড়াতে পারেননি। মামলার রায় নতুন করে তার বিপক্ষে না গেলে তিনি এবার নির্বাচন করতে পারবেন। এ কারণে এরশাদ মনে করছেন আগামী নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ভালো করবে। এরশাদই সরকার গঠনে ভূমিকা রাখবেন। এরশাদ একটি জোট গঠনের চেষ্টা কররছেন। কাদের সিদ্দিকীর কৃষক জনতা লীগ, বদরুদ্দোজা চৌধুরীর বিকল্প ধারা, জাকের পার্টি, চরমোনাই পীর, ইসলামী ঐক্যজোটের কয়েকটি অংশ এ জোটে থাকবে বলে জানা গেছে। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ২০০০কে বলেন, 'আমার পার্টি আগামীতে ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়। এ কারণে সরকার বিএনপি ও আওয়ামী লীগ যে কারো সঙ্গে আমরা থাকতে পারি।' তবে এরশাদ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন সংস্কারের পক্ষে। সংশোধন না হলে এরশাদও নির্বাচন বর্জন করতে পারেন। তবে এরশাদ এখন বেশ বেকায়দায় রয়েছেন রওশন এরশাদকে নিয়ে। রওশন এরশাদ চারদলীয় জোটে যেতে মরিয়া। জোটে না গেলে জেল, এ ভয় নাকি তিনি এরশাদকে দেখাচ্ছেন। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট আগামী নির্বাচনে নির্বাচনী সমঝোতা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ড. কামাল হোসেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন। ইতিমধ্যে কামাল হোসেন এরশাদের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে ফেলছেন। এরশাদ মূলত কৌশলগত অবস্থান নিয়েই চলছেন। তিনি সরকার ও বিরোধী শিবিরের মাঝামাঝি রয়েছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ই তিনি তার

অবস্থান চূড়ান্ত করবেন।

বিএনপি এরশাদকে কাছে রাখতে চায়। আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন বর্জন করেই, তাহলে এরশাদের জোট নির্বাচন করলে রাজনীতির সমীকরণ হবে অন্য রকম। সে ক্ষেত্রে একটি নির্বাচন করে বিএনপি টিকে যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগকে খুবই বড় ধরনের খেসারত দিতে হবে। তবে সবাই মিলে নির্বাচন বর্জন করলে দেশ ভয়াবহ পরিণতির দিকে যাবে।

কার্যত রাজনীতিতে চলছে জোট। নির্বাচনে জয়ের হিসাব। এ হিসাব বিরোধী শিবির থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন সংস্কারের দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে নাকচ করা হয়েছে। জয় ও পরাজয় হিসাবের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। দেশের সুশীল সমাজ থেকে দাবি তোলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের। ভোটার তালিকা ও পরিচয়পত্র প্রদানের। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রসঙ্গে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. মোজাফফর আহমদ ২০০০কে বলেন, 'খুব অল্প সময়ের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা দাঁড় করিয়ে যে ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা মোটেই ঠিক হয়নি। এটা সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আর একটি বড় সংকটের মুখোমুখি হয়েছি।'

ড. মোজাফফর আহমদ আরো বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা পুনঃপরিবর্তন করে কোনো কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। বরং নির্বাচনী সংস্কার করাটা জরুরি। যাতে নির্বাচনে ভালো-সৎ-জনকল্যাণে নিবেদিত জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে সে ব্যবস্থা জরুরি। ড. কামাল হোসেন দাবি করেছেন, সংবিধান সংশোধনী ছাড়াই সবার সঙ্গে আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানকে নির্বাচন করা যায়। সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি রোকন উদ্দীন মাহমুদ ২০০০কে বলেন, প্রচলিত আইনেই সুশীল সমাজের মধ্য থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নিয়োগ করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে কলুষমুক্ত করতে চায় না। তারা চায় ক্ষমতায় যেতে ও টিকে থাকতে। ক্ষমতার হালুয়া-রুটির ভাগ পেতে। নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নির্বাচনকে পেশি ও কালো টাকা মুক্ত করা। সৎ ও রাজনৈতিক ত্যাগী নেতাকে মনোনয়ন দেয়া। রাজনৈতিক দলগুলো কি এ কাজটি করবে! আগামী সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এখনই চলছে টাকার খেলা। কালো টাকার মালিকেরা নমিনেশন পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন এগিয়ে আসছে। রাজনৈতিক ঘোলাটে পরিবেশে জনগণ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচন বর্জনে জনমনে সংশয় বাড়িয়ে দিয়েছে। বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের দাবি না মানার প্রশ্নে অনড়। বিএনপি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্ভাব্য প্রধান সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এমএ হাসানের হাতে সংবিধানসম্মতভাবে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করে, তাহলে আওয়ামী লীগ বেশ বেকায়দায় পড়বে। কারণ আওয়ামী লীগের সত্যিকার বিশ্বস্ত বন্ধু নেই। জাতীয় পার্টি, বি. চৌধুরী নির্বাচনে যেতে পারেন। বামদের ওপর পুরো আস্থাও আওয়ামী লীগ রাখতে পারবে না। এমন শোনা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগকে কৌশলে বাইরে রেখেও নির্বাচনে যেতে অনেকে প্রস্তুত। তবে বিরোধী সকল দল মিলে আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচন বর্জন করাতে পারে, সে ক্ষেত্রে তারা লাভবান হবে।

আওয়ামী লীগের নির্বাচন বয়কট হবে আত্মঘাতি। বিএনপির উচিত সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি করা। বিএনপির মনে রাখা উচিত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর তারাও চলে আসবে বিরোধীর কাতারে। সহানুভূতি পাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগ লতিফুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও এমএ সাঈদকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বানিয়েছিল। ফল পেয়েছে উল্টো। এ কারণে নির্বাচনের খেলায় সত্যিকারের নিরপেক্ষ রেফারি সবার প্রয়োজন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কার প্রশ্নে বিএনপি

বাংলাদেশ এখন বিদেশীদের কাছে বিনিয়োগের ভালো জায়গা। আমেরিকা, কোরিয়া, সুইডেন, ইটালি, ভারতসহ বিভিন্ন দেশ বিনিয়োগ করার জন্য আসছে। তারা বুঝতে পেরেছে, এ দেশে বিনিয়োগ করলে তাদেরও লাভ, এ দেশেরও লাভ। বিরোধী দল এই পরিবেশকে ধ্বংস করছে। ক্ষমতায় যেতে পারবে না বলে হতাশ হয়ে এখন লেগেছে কেয়ারটেকার সরকার নিয়ে। তাদের আসন আরো কমে যাবে বলে নির্বাচন বর্জন করতে চাইছে।

খালেদা জিয়া
প্রধানমন্ত্রী

জোট সরকারের উন্নয়ন ও উৎপাদনের ধারা দেড় বছর অব্যাহত থাকলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত। এটা উপলব্ধি করেই তারা বাঁকা পথে কারচুপি করে ক্ষমতায় আসতে চায়। এজন্য তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিবর্তনের কথা বলছে। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিএনপি জয়ী হবে। বিএনপি জনতার শক্তিতে বিশ্বাসী আর আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে কারচুপিতে।

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, মহাসচিব

বিরোধী দল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের দাবি তুলেছে। আসলে আওয়ামী লীগ বুঝতে পেরেছে যে, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন হলে তারা কখনোই জয়ী হতে পারবে না। এজন্য তারা এখন এসব অযৌক্তিক দাবি তুলে দেশকে অস্থিতিশীল করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু এতেও সাড়া মিলছে না। সংবিধান হচ্ছে পবিত্র দলিল। কোনো ব্যক্তি বা দলের দাবির কারণে তা পরিবর্তন করা যায় না।

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, আইন, বিচার, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী

দেশের বর্তমান উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতি দেখে বিরোধী দল বুঝতে পেরেছে যে জনগণ তাদের আর ভোট দেবে না, তাই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু সৃষ্টি করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে মাত্র ৩টি নির্বাচন (পরপর) হয়েছে, আরো কয়েকটি নির্বাচন হলে আমাদের মধ্যে পরাজয় মেনে নেয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। ১৯৯১ সালে এবং ২০০১ সালে শেখ হাসিনা বললেন, কারচুপি হয়েছে কিন্তু ১৯৯৬ সালে তিনি জিতেছিলেন বলে আর কারচুপির কথা বলেননি। আসলে ৩টি নির্বাচনই ভালো নির্বাচন হয়েছে। ১৯৯৬ সালে জনতার মঞ্চ করা কয়েকটি জেলার ডিসি কিছু সমস্যা তৈরি করেছিল। সেসব জেলা ছাড়া বাকি জায়গাগুলোতে নির্বাচন ঠিকই ছিল। তারপরও আমরা তা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেখ হাসিনা মানছেন না।
আওয়ামী লীগের নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশনার, আইজি এবং সেনাবাহিনী প্রধানের অধীনেই নির্বাচন হলো। তারা তাদের লোক বলেই ওনাদের সেসব পদে বসানো হয়েছিল। তারা হঠাৎ করে আমাদের লোক হয়ে গেল কী করে?

সাদেক হোসেন খোকা, মেয়র, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন